একুশের ঢেউ EKUSHER DHEU

ISSN: 2454-7182
IMPACT FACTOR: 8.158
ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক আন্তর্জাতিক অনলাইন পিয়ার-রিভিউড গবেষণা পত্রিকা (রেফারিড জার্নাল, ত্রৈমাসিক)
An International Online Indexed Research Journal of Language, Literature and Culture covering Arts & Humanities as a broad area (Peer-reviewed, Refereed Journal, Quarterly)

PSYCHOANALYSIS OF TARASHANKAR BANDYOPADHYAY'S SHORT STORIES & HIS PHILOSOPHY OF LIFE & LITERATURE

মনস্তাত্ত্বিক দর্শন ও জীবন-দর্শন: মাধ্যম সাহিত্যবিশ্লেষণ (তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পের মনস্তাত্ত্বিক পাঠের নিরিখে)

Name of the author: DR. ARGHYADIP BANERJEE
Affiliation: State Aided College Teacher in Seth Anandram Jaipuria College (affiliated with Calcutta University)

Abstract: Psychoanalytic criticism is one of the most renowned ways of criticism in the world of art & literature. Sigmund Freud, the man, who had introduced this type of criticism. As well as his psychoanalytic theories have deeply influenced modern literature. There are many kinds of psychoanalytic criticism, but here we have chosen mainly Freudian theory; to some extent Karl Jung.

We have selected the literary works (short stories mainly) of Tarashankar Bandyopadhyay, the eminent Bengali writer, to apply that psychoanalytic theory. Not only that, but we also tried to find writer's core mind, where the art originates. And how he reciprocates to the western theories with his Indian mind. Overall we have focused on his literary philosophy.

Keywords: Tarashankar Bandyopadhyay, Sigmund Freud, Psychoanalysis, Kallol Magazine era, Bandyopadhyay troyi, Libido, Indian philosophy.

মনস্তাত্ত্বিক দর্শন ও জীবন-দর্শন: মাধ্যম সাহিত্যবিশ্লেষণ
(তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্পের মনস্তাত্ত্বিক পাঠের নিরিখে)

অর্ঘ্যদীপ ব্যানার্জী

"But then came another hunger
Very deep and ravening ;
The very body's body crying out
With a hunger more frightening, more profound"[১]

"প্রবৃত্তির অবিচ্ছেদ্য কারাগারে চিরন্তন বন্দী করি রচেছো আমায়
নির্মম নির্মাতা মম! এ কেবল অকারণ আনন্দ তোমার!
মনে করি, মুক্ত হবো; মনে ভাবি, রহিতে দিবো না
মোর তরে এ-নিখিলে বন্ধনের চিহ্নমাত্র আর।

... ...
বাসনার বক্ষোমাঝে কেঁদে মরে ক্ষুধিত যৌবন,
দুর্দম বেদনা তার স্ফুটনের আগ্রহে অধীর।
রক্তের আরক্ত লাজে লক্ষ বর্ষ উপবাসী শৃঙ্গার-কামনা
রমনী-রমন-রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগে নিতি;

... ...
বিধাতা, জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।"[২]

প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি সেই দ্বি-মুখী পাখির মতন সভ্যতার অঙ্গে দ্বান্দ্বিকভাবে সতত ক্রিয়াশীল। ফ্রয়েডীয় মতে সভ্যতা যেমন অবদমনের ফলশ্রুতি, ইয়ুং-এর মতানুযায়ী সভ্যতা প্রকৃতার্থে ঊর্ধ্বায়ন। প্রবৃত্তির মাধ্যমে সমাজ প্রবহমান। ঊর্ধ্বায়নের মধ্য দিয়ে সংস্কৃতির উজ্জীবন লাভ। কিন্তু নিবৃত্তি? নিবৃত্তির প্রশ্নেই দ্বন্দ্বাকীর্ণ হয়ে ওঠে নিশ্চেতন। আলোর দিকে, সুষমার দিকে মানুষের যাত্রা অবিরত। তবুও কী এক অদৃশ্য অন্ধকার চেতনা টান মারে অতল জলের অভিমুখে, তা বোধ হয় মনেরও অগম্য। এখানেই জন্ম হয় অধিশাস্তা। ফলত দ্বন্দ্ব চলতেই থাকে, আলোকাভিসারী ও অন্ধকারাভিমুখী দুই শক্তির। এই দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষিত থেকেই আমরা যে সাহিত্যিকের নির্বাচিত ছোটগল্প অবলম্বনে আলোচনায় অগ্রসর হচ্ছি তার সাহিত্যের মূল ধরতাই – দ্বন্দ্ব। সে দ্বন্দ্ব সময়ের, সমাজের, আদর্শের।

পূর্ব পরিচ্ছেদে আলোক ও অন্ধকারের উল্লেখ পারস্পরিক বিপ্রতীক তা বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়েছে। তিনটি ব্যাপার একটি জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। বেঁচে থাকার লড়াই, ক্ষুধা ও কামপ্রবৃত্তি এবং মৃত্যুচেতনা তথা মৃত্যুভয়, এই তিনটিই কিন্তু জড়িয়ে আছে প্রবৃত্তির সঙ্গে। সমাজের সংখ্যাগত দিক থেকে

অগ্রগতির কারণও এটি। আবার মেধা–সংস্কৃতিগত দিকের সঙ্গেও প্রবৃত্তির যোগ। এক সর্বাঙ্গীন প্রবৃত্তির জলছবি। ফ্রয়েডীয় ভাষায় লিবিডো। এক লিবিডো জন্ম থেকে মৃত্যুর দ্বার অবধি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয় জীবনে। এবং সেই প্রকাশ দ্বান্দ্বিক। যেমন Eros এবং Thanatos দুইই প্রভাব বিস্তার করে চেতনায়। আবার এর সঙ্গেই জড়িত Thanatophobia (মৃত্যুভয়), যা জীবনসংগ্রামে টিঁকে থাকতে প্রেরণা জোগায়। এর-ই পরবর্তী ধাপ, কামপ্রবৃত্তির সঙ্গে জড়িত যা বংশবিস্তারে সাহায্য করে। সেকারণেই হয়ত রবীন্দ্রনাথ Sex-instinct–এর পরিবর্তে Self-assertion ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদিকে যেমন ছিল ভারতীয় দর্শন ও অনুভাব, তেমন অন্যদিকে সেই সময়কাল। আঠেরো-উনিশ শতকের Age of Reason শেষ হয়ে তখন Age of Interrogation-। প্রবাহিত কার্যকারণ যুক্ত চেতনাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বিচ্ছিন্ন একক সত্তাকে ক্ষতবিক্ষত করে সেইসময়। এরই সমান্তরালে আর্থিক, রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন। একদিকে বিশ্বযুদ্ধ অন্যদিকে রুশ-বিপ্লব। আবার সংস্কৃতিগত দিক থেকে ফ্রয়েড, আইনস্টাইন। এই পরিপ্রেক্ষিতেই জন্ম কল্লোলযুগের। তারাশঙ্করেরও যাত্রা শুরু।

কিন্তু সেই যুগের হয়েও তারাশঙ্করের সাহিত্য কল্লোলগোষ্ঠীর থেকে ভিন্ন পন্থাবলম্বী। সুকুমার সেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন – "তারাশঙ্করবাবুর দৃষ্টি শৈলজানন্দের মতো উদাসীন ও নিরাবিল নয়। সে দৃষ্টিতে হৃদয়াংশ যুক্ত আছে এবং তাহাতে অতীতের প্রতি টান অননুভূত নয়।"[৩] পার্থক্য এখানেই সূচিত হয়েছে। কল্লোলের যথাস্থিতবাদকে (Naturalism) তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি সর্বাংশে আবার এড়িয়েও যেতে পারেন নি। দ্বন্দ্বের সূচনা এখান থেকেও। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত পরবর্তীকালে 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে লিখেছেন – "তারাশঙ্কর যে মিশতে পারেনি তার কারণ আহ্বানের অনান্তরিকতা নয়, তারই নিজের বহির্মুখিতা। আসলে সে বিদ্রোহের নয়, সে স্বীকৃতির, সে স্থৈর্যের। উত্তাল ঊর্মিলতার নয়, সমতল তটভূমির কিংবা, বলিতুঙ্গগিরিশৃঙ্গের।"[৪] উত্তরে তারাশঙ্কর 'আমার সাহিত্যজীবন' গ্রন্থে বলেছেন – "বিদ্রোহ এবং বিপ্লবে প্রভেদ আছে। আমি বিদ্রোহের ছিলাম না। বর্তমানকে ভেঙেচুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনায় আমার মনের পরিতৃপ্তি কোনোদিন হয়নি। আমার রচনার সমাপ্তি বিশ্লেষণ করলেই এটা বোধহয় স্পষ্ট ধরা পড়ে। আমার মনে ভেঙে গড়ার গভীর স্বপ্ন ছিল।"[৫]

কান্টিনেন্টাল সাহিত্যের আবহাওয়ার মধ্যে থেকেও এক ভিন্নপথের যাত্রী তারাশঙ্কর এবং সমসাময়িক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যে কামনা ক্ষুধা, বীরংসা দলিল হয়ে উঠেছিল এক বিশেষ শ্রেণির সাহিত্যের অনুপ্রেরণায়, সেখানে এই দুজন বাঁকবদল করলেন সাহিত্যধারার। বিভূতিভূষণের ক্ষুধা – জঠর ক্ষুধা ছাড়িয়ে আত্মিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষুধায় উন্নীত হয়েছে। অন্যদিকে তারাশঙ্করের ক্ষুধা–রীরংসা প্রবৃত্তি থেকে বেরিয়ে বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষায় পর্যবসিত। আরেক বন্দ্যোপাধ্যায় (মানিক) আবার ক্ষুধাকে দেখালেন অন্য প্রেক্ষিতে। ফ্রয়েড থেকে মার্ক্স-এ আশ্রয়। আসলে ফ্রয়েডই চিত্রটা বদলে দিলেন। উনিশ শতকের শেষে ফ্রয়েডের গবেষণা যাবতীয় উনিশশতকীয় নিশ্চয়াত্মক ধ্রুববাদী বিজ্ঞান-দর্শনের ইতি ঘটাল। যদিও ফ্রয়েডীয় দর্শন প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নয়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে ফ্রয়েডীয় দর্শনকে অবলম্বন করলেও পরে তা অবৈজ্ঞানিক বলে ফিরে গেলেন মার্ক্সের কাছে। এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুধাকে দেখেছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে। বিভূতিভূষণ যেমন বলা হল

জঠরক্ষুধা ও আত্মিকক্ষুধা। 'কিন্নরদল' গল্পটি এই বিষয়ে প্রতিনিধিস্থানীয়। পেটের অন্ন শুধু নয়, শিল্প-সঙ্গীতসুধাও মানবীয় ক্ষুধার অঙ্গীভূত। মানিকের ফ্রয়েড থেকে মার্ক্সে গমন ক্ষুধার প্রেক্ষিত পালটে দেয়। যৌনক্ষুধা থেকে জঠরক্ষুধায়। এরই মধ্যে তারাশঙ্কর মানবিক কামনাক্ষুধাকে জড়িয়ে দিলেন অস্তিত্বের সঙ্গে। এই মনোভাব সৃজনে সাহায্য করেছে ভারতীয় দর্শন তথা আধ্যাত্মিক সাহিত্য। 'আমার সাহিত্যজীবন' বইতে তারাশঙ্কর বলছেন – "ভারতবর্ষের রূপ যদি কেউ আকাশপথে ঘুরে এসে ছবি আঁকে তবে তাকে আঁকতে হবে, অসংখ্য দেউল মন্দির আকাশ-পথে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে ... তার আকাশমুখী চূড়ার সূক্ষাগ্র যেন মনোলোকের ঊর্ধমুখী বাসনার প্রতীক।"[৬] কামনার ঊর্ধায়ন। ফ্রয়েডীয় ঊর্ধায়ন (Sublimation) তত্ত্ব দিয়ে যার অনায়াস ব্যাখ্যা চলে। তবে কি এটি প্রত্যাবর্তনের যুগ? প্রাচীন সভ্যতার কাছে? "তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণের আবির্ভাবকাল এই অর্থে আরও জটিল। এর কারণ, পাশ্চাত্ত্যে জীবন-চেতনা ও ভাবধারার প্রভাব এই যুদ্ধোত্তরপর্বে আরও অনিবার্য ও অমোঘ হয়ে উঠেছিল। জীবনের প্রচলিত মূল্যবোধ সম্পর্কে সংশয় এবং বুদ্ধি-সচেতন নাগরিকতা 'ভারতী পর্বে'র তুলনায় 'কল্লোলপন্থী'দের চেতনায় আরও বেশী পরিস্ফুট হয়েছিল। মোটামুটিভাবে তরুণ লেখকদের প্রচেষ্টায় বাঙলা কথাসাহিত্যের গতি-প্রকৃতি যেন এক সুনির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল। সেই পাশ্চাত্ত্যভাব-ভাবনা ও সাহিত্যের দ্বারা প্রভাবিত এবং সংশয় ও জিজ্ঞাসার কন্টকে বিদ্ধ এই 'বিদ্রোহী' কথাসাহিত্যের ধারায় তারাশঙ্কর ও বিভূতিভূষণের মাটি-ঘেঁষা সাহিত্যে সুস্থ সহজ জীবন-প্রত্যয়, গূঢ় আস্তিক্য-চেতনার ও স্বীকৃতির সুরকে 'অপ্রত্যাশিত' মনে হওয়াই স্বাভাবিক।"[৭] এই 'অপ্রত্যাশিত' ব্যাপারটি ঘটেছিল এক দ্বন্দ্বময় পরিবেশে। একদিকে বিশ্বযুদ্ধোত্তর হতাশা আবার অন্যদিকে রাশিয়ার বিপ্লবের পর নতুন সমাজগঠনের আশাব্যঞ্জক সময়। পৃথিবীব্যাপী মন্দায় যখন ক্ষুধার নতুন সংজ্ঞা রচিত হচ্ছে, তেমনি ফ্রয়েড প্রমুখের গবেষণায় ক্ষুধার সর্বগ্রাসী চেতনার কথা ফুটে উঠছে। আবার তখনই ভারতে মহাত্মাগান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সূত্রপাত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যিকে এই সামগ্রিক প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়েই বিচার করতে হবে।

এবার চলে আসা যাক নির্বাচিত কিছু ছোটোগল্পের আলোচনায়। এই আলোচনা হবে মূলত মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি চিঠির বয়ানের দিকে প্রথমে লক্ষ রাখা যাক – "মানুষের দিকে তাকিয়ে আজকাল কি দেখতে পাই জানিস? সেই আদিম পাশব ক্ষুধা-হিংসা, বিষ আর স্বার্থপরতা। চোখের বাতায়ন দিয়ে শুধু দেখতে পাই সুসভ্য মানুষের অন্তরে আদিম পশু ওৎ পেতে আছে। যে চোখ দিয়ে মানুষের মাঝে দেবতাকে দেখতুম সেটা আজ অন্ধ প্রায়। আমার যেন আজকাল ধারণা হয়েছে এই যে, লোকে বন্ধুকে ভালবাসে এটা নেহাৎ মিথ্যে – মানুষ নিজেকেই ভালোবাসে। যে বন্ধুর কাছে অর্থাৎ যে মানুষের কাছে সেই নিজেকে ভালবাসার অহংকারটা চরিতার্থ হয়, অর্থাৎ যার কাছ থেকে সে নিজের আত্মম্ভরিতার খোরাক পায় তাকেই সে ভালবাসে মনে করে। দরকার মানুষের শুধু নিজেকে; শুধু নিজেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে সে অহংকার চরিতার্থ করতে চায়।"[৮] এর পাশে আমরা রাখতে চাই তারাশঙ্করের 'তারিণী মাঝি' গল্পটিকে। সুখীর প্রতি প্রেম তারিণীর জীবনে এক সম্পদ বলে প্রতিভাত হয়। এক হিসাবে

সুখীময় জীবন। ময়ূরাক্ষী এবং সুখী। নদী ও নারী। এই দুই রহস্যময়ী। এক দুর্যোগপূর্ণ দিনে নদীর ভাঙনে যখন তারিণী সুখীকে নিয়ে নতুন জীবনের দিকে চলেছে, তখন প্রবল স্রোতে সুখী তলিয়ে গেল মৃত্যুর স্রোতে। কিন্তু এতো তলিয়ে যাওয়া নয়, তলিয়ে দেওয়া। "বাতাস-বাতাস। যন্ত্রণায় তারিণী জল খামচাইয়া ধরিতে লাগিল। পরমমুহূর্তে হাত পড়িল সুখীর গলায়। সে কি তাহার উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ ... যে বিপুল ভারটা পাথরের মত টানে তাহাকে অতলে টানিয়া লইয়াছিল, সেটা খসিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জলের উপরে ভাসিয়া উঠিল। আঃ, আঃ – বুক ভরিয়া বাতাস টানিয়া লইয়া আকুলভাবে সে কামনা করিল, আলো ও মাটি।"[৯] সুখীর প্রতি প্রেমের পরিণতি যেন এক বিরোধাভাসের বজ্রাপাতে স্বরূপ উন্মোচন করল। মানুষের বেঁচে থাকার প্রবৃত্তি মৌলতম, তা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এই প্রবৃত্তিই একপ্রকার আত্মরতির জন্ম দেয়। মনস্তাত্ত্বিকদের তত্ত্বানুযায়ী মানুষের জীবনে তিনটির তিপর্ব– (১) স্বতঃরতি (Auto-erotism) (২) আত্মরতি (narcissism), (৩) বস্তুরতি (Object-sextuality)। বস্তুরতির আবার বিভিন্ন পর্ব আছে। প্রাথমিক থেকে পরবর্তী ধাপে, পর্বান্তরে গিয়েও মানুষের মধ্যে রয়ে যায় পূর্ববর্তী পর্যায়ের কিছু লক্ষণ, স্মৃতি। এবং কোন বিশেষ কারণে একটি পর্যায়ে কখনো কখনো মানবমন স্থিত হয়ে পড়ে, পরবর্তী পর্বে পৌঁছয় না। আবার কোন বিপর্যয়জনিত কারণে পরবর্তীপর্ব থেকে পূর্ববর্তীপর্বে সাময়িক প্রত্যাবর্তনও ঘটতে পারে। তারিণীর ক্ষেত্রেও প্রায় তাই ঘটেছে। বাহ্যিক দুর্যোগ তার বস্তুরতি তথা ইতরকামিতাকে আত্মরতির স্তরে ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। ফ্রয়েড তাঁর বইতে বলছেন - "He seems really to have withdrawn his libido from people and things in the external world, without replacing them by others in phantasy... Thus we form idea of there being an original libidinal cathexis of the ego, from which some is later given off to objects."[১০] এখানে প্রশ্ন উঠবে প্রেমেন্দ্র মিত্রের চিঠির নিরিখে যদি এই গল্পের বিশ্লেষণ করা হয়, সেক্ষেত্রে কল্লোলযুগের থেকে তারাশঙ্করের পার্থক্য কোথায় রইল? তফাৎটা খুব সূক্ষ্ম। প্রেমেন্দ্র মিত্রের চিঠিতে মানুষের আত্মপরায়ণতা এবং তারিণীর আত্মরক্ষা এক হয়েও একটু আলাদা। আত্মরক্ষা মানুষের সহজাত। স্নায়ুবৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এও একপ্রকার conditioned reflex action। সর্বোপরি শেষে তারিণীর আলো ও মাটির অনুভব সেই সৃষ্টির আদিক্ষণকে মনে করিয়ে দেয় মৃত্যুর উপত্যকায় দাঁড়িয়ে। এখানেই তারাশঙ্কর বিপ্লবী, বিদ্রোহী নন। বিপ্লব ধ্বংসের পরবর্তী নূতন সৃজনের প্রস্তাবনাও তুলে ধরে। সেই অস্তিত্ব।

এরপর আলোচ্য 'পিতা-পুত্র' গল্পটি। শিবশেখর এবং শশিশেখর দুই প্রজন্ম। পিতা এবং পুত্র। পিতা ও পুত্রের মধ্যেই দিপাসগূঢ়ৈষার কথা প্রায় সর্বজনবিদিত। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বের অন্যতম মৌলিক ভাবনা ও আকর এই গূঢ়ৈষা।"King Oedipus, who struck his father Laius dead and married his mother Jocasta, is simply the wish- fulfilment of our childhood years... Our first sexual stirring at our mother, our first hatred and violent wish at our father."[১১] আবার টোটেম সৃষ্টির কারণ হিসাবেও বলছেন – "টোটেম প্রাণী আসলে পিতার প্রতিরূপ, এই সত্য মনঃসমীক্ষণ আবিষ্কার করেছে ... যে উভয় বলি প্রক্ষোভীয় মনোভাব আজও আমাদের শিশুদের মনে পিতৃ-গূঢ়ৈষার পরিচায়ক এবং যা প্রায়ই বয়স্কজীবনেও প্রসারিত হচ্ছে তা-ই পিতার প্রতিরূপ টোটেম প্রাণীর প্রতিও সম্প্রসারিত হয়।"[১২] এই উভয়

বলতা শশিশেখরের মধ্যেও লক্ষিত হয়।এবং তার পরিণতি ঘটে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে। এও কি একপ্রকার Oedipus guilt?

এখানে অবশ্যম্ভাবী প্রশ্ন উঠবে, এই গল্পে তো নারী তথা মাতৃঘটিত ব্যাপার নেই! তাহলে কেন ইদিপাস প্রসঙ্গের উত্থাপন? পিতা ও পুত্র – দুই পুরুষ। ইতিহাস সাক্ষী একটি বিশেষ কারণে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ কম হয়নি। কারণটি হল – সম্পত্তি। আলোচ্য গল্পে প্রসঙ্গত শিবশেখরকে তাঁর স্ত্রী শিবরাণীকে বলতে দেখা যায় – "পুরুষেরা যা নিয়ে বিবাদ করে, ঈর্ষা করে, ভগবান তার হাত থেকে আমাকে রক্ষা করেছেন। সাম্রাজ্য দূরের কথা, সামান্য বিষয়ও আমার নেই শিবরাণী।"[১৩] কিন্তু সম্পদ কি শুধু বস্তুগত সম্পত্তি? অধীত বিদ্যাও কি সম্পদ নয়! বৌদ্ধিক দ্বন্দ্বের শুরু এখানেই। কথিত আছে 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'। অর্থাৎ বসুন্ধরা এখানে নারীরূপে চিহ্নিত। এভাবেই সম্পত্তি ও নারী একীভূত হয়ে গেছে। এঙ্গেলসের উক্তি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য – "But to whom did this new wealth belong? Originally to the gens, without a doubt. Private property in herds must have already started at an early period ... Once it had passed into the private possession of families and there rapidly begun to augment, this wealth dealt a severe blow to the society founded on pairing marriage and the matriarchal gens... Thus, on the one hand, in proportion as wealth increased, it made the man's position in the family more important than the women's ..."[১৪] ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ও ব্যক্তিগত সম্পদের বৃদ্ধির সঙ্গে সমাজে নারীর অবস্থান ব্যস্তানুপাতিক। অর্থাৎ সম্পত্তির সঙ্গে নারীর যোগ এখানে স্পষ্টত ফুটে উঠছে। শিবশেখর এবং শশিশেখরের কাছে তাদের অধীতবিদ্যাই ছিল সম্পদ-সম্পত্তি। এই সম্পত্তিভোগ, নারীসঙ্গের মতই। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এই উপভোগের মধ্যে একরকম যৌন সুখ খুঁজে পাওয়াও বিচিত্র নয়। অর্থাৎ মানসিক রমণ সুখ। যেমন যিনি সুবাগ্মী এবং বক্তৃতা দিতে পছন্দ করেন, তাঁর ওপর Oral drive stage বিশেষভাবে কার্যকর বলে মনে করেন মনস্তত্ত্ববিদগণ। ফলত পিতা-পুত্রের বিবাদ তাদের সম্পদ, অধীত বিদ্যা নিয়েই।এবং সম্পদ-সম্পত্তি নারীদ্যোতক।

কর্ম তথা জীবিকার সঙ্গে সুখভোগের নীতি (Pleasure Principle) কীভাবে জড়িত তা আমরা দেখলাম। এখানেই রাখা যেতে পারে 'নারী ও নাগিনী' গল্পটিকে। মানুষের বস্তুরতি তথা ইতরকামিতার স্তরে এমন অনেক বস্তুর প্রতি আকর্ষণ লক্ষ করা যায় যা সাধারণদৃষ্টিতে ভয়ানক অথবা ন্যক্কারজনক। সেটিই বিশেষ কিছুক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়ে Fetish-এ রূপান্তরিত হয়। খোঁড়া শেখের ক্ষেত্রে কিছুটা এমনই ঘটেছে। যদিও Festish মূলত অজৈব বস্তুকেন্দ্রিকই দেখা যায়, তবে তার ব্যতিক্রমও আছে। Oxford Dictionary অনুযায়ী Fetish-এর সংজ্ঞা হিসাবে বলা যেতে পারে - "A form of sexual desire in which gratification is linked to an abnormal degree to a particular object".[১৫]খোঁড়া শেখের বসা নাক নির্ভুলভাবে তথাকথিত বিকৃত যৌনজীবনেরই ইঙ্গিত দেয়। বিশেষত উদয়নাগ সর্পিনীর সঙ্গে তার যে সম্পর্ক সেখানে যেন প্রাক্‌সভ্যতার একটি সময় উঠে আসে। সেখানে লৈঙ্গিক পরিচয়ই মূল। পুরুষ এবং নারী। মানব বা

মানবেতরের পার্থক্য সেখানে অমূলক। এখান থেকেই আসে ঈর্ষা। জোবেদা ও নাগিনীর ঈর্ষার বিষে জর্জরিত হয়ে মারা গেল জোবেদাই। খোঁড়া নাগিনীকে হত্যা করতে চেয়েও পারল না।অদ্ভুত তাদের সম্পর্ক।

এই সূত্র ধরেই আসতে পারে 'বেদিনী' গল্পটি। ফ্রয়েডের মতে - "In his case it is the discovery of the possibility of castration, as proved by the sight of the female genitals, which forces on him the transformation of his Oedipus complex, and which leads to the creation of his super- ego and thus initiates all the processes that are designed to make the individual find a place in cultural community. After the paternal agency has been internalized and became a super- ego..."[১৬] কিন্তু "The cultural consequences of its break–up are smaller and of less importance in her"[১৭] অবশ্য নারীর অধিশাস্তা বিষয়ক ফ্রয়েডীয় প্রস্তাব একাধিক নারীবাদী মনস্তত্ত্ববিদের দ্বারা সমালোচিত। তবে 'বেদেনী' গল্পটিকে রাখা যেতে পারে, সেই প্রাক্ সভ্যতার যুগে। Barbarian যুগ, যখন একগামিতা পরিবারের একক হয়ে ওঠেনি। রাধিকা তাই অনায়াসেই একাধিক পুরুষের শৌর্যে মুগ্ধ হতে পারে। জগদীশ ভট্টাচার্য তারাশঙ্করের রচনা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন – "তারাশঙ্করের চিত্তবৃত্তি নয়, মানুষের ধাতুপ্রবৃত্তিরই দুর্দমনীয় বিকাশ ... তারাশঙ্করের সাহিত্যে প্রবৃত্তিই মানুষের নিয়তি। এই প্রবৃত্তির হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই, অমোঘ নিয়তির অনিবার্য পরিণামকে এড়িয়ে যাবার কোন শক্তি নেই তার।"[১৮] এই প্রবৃত্তির বশে একদিন শম্ভুর সঙ্গে রাধিকা ঘর ছেড়েছিল। আজ শম্ভুকে ছেড়ে যাচ্ছে সে। কিন্তু এর মধ্যে যেন একরকম প্রতিশোধই নিল রাধিকা। যৌনতা এখানে অস্ত্র। সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেষ্টোকে নিয়ে সে পালায়। বা হয়ত মনে করিয়ে দেয় সেই আদিম কৌমসমাজকে। যেখানে নারীর ছিল শুধু নির্বাচন নয়, পরিত্যাগেরও অধিকার। যেখানে সামাজিক ট্যাবু মনে বাসা বাঁধেনি। নারীর সৃজনধর্মী কামনার বিপ্রতীপে রাখতে চান লেখক এই ধ্বংসাত্মক বাসনাকে। তাই সে বেদেনি। যাযাবর। স্থায়ী আবাস তার জন্য নয়। স্থায়ী আশ্রয়ও নয়। এক নারীপ্রধান সমাজের দিকেও ঈঙ্গিত করে এই গল্প। নারীর কামনাকে অর্গলমুক্ত করে দেখায়, যেটি ছিল সবথেকে নিষিদ্ধ। নারীর আনুষঙ্গিক সুখনীতি নিয়ে যে মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা, সেটিকে যেন প্রশ্নবিদ্ধ করে।

অন্যদিকে 'দেবতার ব্যধি' গল্পে আমরা এক চিকিৎসকের অসহায়তার চিত্র দেখি। জীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির কিয়দংশ তিনি ছেঁটে ফেলে বাঁচতে চেয়েছিলেন। ফলত প্রবৃত্তি প্রতিশোধ নিল ভয়ঙ্করভাবে। আজ চিকিৎসক তা বুঝতে পারেন। গ্রামের স্কুলের হেডমাস্টারের কাছে তিনি নিজের স্বরূপ উন্মোচন করেন। ধীরে ধীরে হেডমাস্টার সম্বোধন হয়ে ওঠে মাস্টারমশাই। এ শুধু অন্তরঙ্গতা নয়। মাস্টারমশাই যেন অধিশাস্তা বা মনের পরামর্শদাতা। মনোচিকিৎসক তথা বিশ্লেষকের কাছে মানুষ যেমন স্বীকারোক্তি করে, তেমনি ডাক্তার করলেন চিঠির মাধ্যমে। "সেই যে জাগল ক্রুরপ্রবৃত্তি, তার নিবৃত্তি আর হ'লনা। শুধু তার আহূতি নিয়েই তৃপ্ত থাকতে পারলাম না ... দেবতার ক্ষুধার্ত আক্রমণের মুখে মানুষ কিন্তু অসহায়। সেখানে তার কোনক্রমেই নিস্তার নাই। আমার ক্ষুধার্ত দেবরূপ অবাধ গতিতে আদায় আরম্ভ করলে তার নৈবেদ্য – তার বলি।"[১৯] রীরংসা কতক্ষেত্রে অনুকম্পা, শ্রদ্ধা, স্নেহ হয়ে প্রকাশ পায় মনঃসমীক্ষণের দৌলতে তা আমাদের অজানা নয়।

গল্পে ডাক্তারেরও তাই ঘটেছিল। দ্বিতীয়ত প্রবৃত্তির দাবীকে তিনি Sublimate না করে Eliminate করতে চেয়েছিলেন। সেই অসহায় অবস্থায় মাস্টারমশাই, অর্থাৎ যাঁর কাজ হল চরিত্রগঠন, তাঁর কাছে স্বীকারোক্তি, নিজের কাছেই স্বীকার এবং সেই প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে মাস্টারমশাইও তাঁকে ক্ষমা করেন।

এই ক্ষমাধ্বনিই শোনা যায় ব্রজরানীর কণ্ঠে 'না' গল্পে। অনন্তর কাম একসময় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ক্রোধে রূপান্তরিত হয় এবং জিঘাংসা প্রবৃত্তিকে উসকে দেয়। পরবর্তী সময়ে সেই ক্রোধ যেন অনুশোচনার রূপ নেয়। ব্রজরানীর ক্ষেত্রে ক্রোধ অনুকম্পায় পরিণত হয়। তার যা ছিল শোক, তাই আজ হল শান্তি। এখানেই মানুষের ঊর্ধ্বায়ন। যেমন 'বোবাকান্না' গল্পে মূকবধূটির নীরব ক্রন্দন বিজ্ঞান, ধর্ম ইত্যাদির খোলস ভেদ করে মানুষের বুকে তা ধ্বনিত হয়। 'রসকলি' গল্পেও ত্যাগই হয়ে উঠল প্রেম। মনস্তাত্ত্বিকদের মতে অভাব থেকে প্রেমের জন্ম। কিন্তু মানুষই সেই প্রাণী যে কখনো কখনো অভাবকেই বরণ করে নেয়। যদিও মনস্ততাত্ত্বিক বিশ্লেষণে একে মর্ষকামিতা রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ সামগ্রিক মানবপ্রজাতির মনের রূপরেখা আঁকতে পারে না। তাই কেবল মর্ষকামিতা নয়, সমতাবিধান ও আত্মবিলোপও প্রেমের অঙ্গীভূত। বামমার্গী বিশ্লেষণে এটি সামন্ততান্ত্রিক চেতনা বা মনোভাব। কিন্তু শাক্ততন্ত্র ও বৈষ্ণবতত্ত্বে সুস্নাত তারাশঙ্কর জানেন সামরস্যের কথা। অর্থাৎ সমরস। 'নাসোরমণনাহামরমণী'। অদ্বয়তত্ত্ব। বৈষ্ণব ধারায় এটিই প্রেম, যাথেকেপিরীতি। এক সাধনলব্ধ বিষয়। গল্পটিও বৈষ্ণব পটভূমিতেই লেখা। এখানেই আসে ঊর্ধ্বায়ন প্রসঙ্গ। যেমনটি ঘটেছে 'ইমারত' নামক ছোটগল্পটিতে। জনাব শেখের হাতে গড়া মন্দির এবং ঈশ্বর-প্রকৃতি সৃষ্ট বটগাছের ছায়া। সমস্ত কিছু ঘিরে বৃষ্টি যেন ঈশ্বরের করুণাবর্ষণ। "জনাব তাকালে উপরে – বুড়া বটগাছের পাতায় পাতায় ঢাকা গোল গম্বুজের মতো মাথার দিকে। খোদাতালার নিজের হাতে গড়া ইমারত।"[২০] এখানে আবার আমরা মন্দিরের প্রতীকে ঊর্ধ্বায়নের ঈঙ্গিত পাই।

নিবিড় দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে, সাহিত্য যেমন মনস্তত্ত্বকে আত্তীকরণের ইতিহাস, তেমনি তাকে বর্জনেরও ইতিবৃত্ত। স্বয়ং তারাশঙ্করের ভাষায় – "জন্তু বা animal সে কখনই নয়। জীবন আছে বলে জীব – একথা সত্য বলে মানতেই হবে। কিন্তু বুদ্ধিমান যুক্তিবাদী এবং কাম (লিবিডো) ও অর্থ (মেটিরিয়েলওয়েলথ) নিয়ন্ত্রিত জীব, মানুষের এ সংজ্ঞা আমার কাছে এবং আমার মত কোটি কোটি ভারতবর্ষের মানুষের কাছে ভুল – এটা মানুষের অপমান। মানুষের মধ্যে এমন একটি সত্তা আছে যা কোন জীবজন্তুর মধ্যে নেই।"[২১] ঊর্ধ্বায়নের মাধ্যমে মানুষ হয়ে ওঠে মানুষ। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠবে তারাশঙ্কর তাহলে 'নারী ও নাগিনী' অথবা 'বেদেনী'র মতো গল্প কেন লিখলেন? এও কি একপ্রকার কন্টিনেন্টাল সাহিত্যের প্রভাব? যেখানে বদলেয়ার আধুনিকতাকে সূচিত করলেন পাপের যন্ত্রণা ও উত্তরণের সাংকেতিকতায়? এক্ষেত্রে পার্থক্যটুকু উল্লেখ করলেই যথেষ্ট। পাশ্চাত্যে পাপের যন্ত্রণা খ্রিস্টিয় শাস্ত্রোক্ত আদিপাপের সঙ্গে সংলগ্ন। এবং শয়তান ভজনা ইত্যাদির ঐতিহ্যও সেখানে প্রাচীন। দান্তের নরকবর্ণনা প্রভৃতি। সেখানে আমাদের শাস্ত্রানুযায়ী আমরা 'অমৃতস্যপুত্রাঃ'। দ্বিতীয়ত, ফ্রয়েডের সর্বযৌনতাবাদী (Pansexuality) তত্ত্বকে পূর্ববর্তী ভিক্টোরিয়ান যুগের যৌনশুচিবায়ুগ্রস্ততার প্রতিক্রিয়া হিসাবেও অনেকে দেখতে চান। এই দুই চরম মতবাদ, তার মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক সহজ জীবন বয়ে যায় আপনখাতে, তাকে বাঁধা যায় না। অবশ্য এক্ষেত্রে লিবিডো ও কাম সম্পর্কিত কিছু কথন প্রয়োজন।

লিবিডোকে অধুনা বেশিরভাগ সময়েই যৌনতার সঙ্গে এক করে দেখা হয়। এটি অর্ধসত্য। যেমন মানুষের সমস্ত আচরণের পিছনে যৌনভাবনা খোঁজা অসত্য। এই সমস্যাটা ফ্রয়েড পরবর্তী গবেষণা বিশ্লেষণ এমনকি চিকিৎসার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। এখন অবশ্য গবেষণার ধারা বদলেছে। এখন ফ্রয়েডের pleasure principal hormonal analysisএ happy hormone-এর আওতাভুক্ত। ডোপামিন যেমন আত্মতুষ্টিসূচক। প্রেমবন্ধন অক্সিটোসিনের দান। যৌনতারও যোগ রয়েছে এর সঙ্গে স্বভাবতই। এছাড়া আছে সেরোটোনিন। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখলে এর সঙ্গে ঊর্ধ্বায়নের যোগ পাওয়া বিচিত্র নয়, এমনকি অধ্যাত্মও। তবুও যৌনতা জীবের অন্যতম চালিকাশক্তি, এটা অস্বীকারের জায়গা নেই। বস্তুত যৌনতাই সব থেকে নিষিদ্ধ ক্ষুধা। তাই বিভিন্ন প্রকারে ও মাধ্যমে তা প্রকাশিত হয়। এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে হয়ে ওঠে অপরিহার্য। কিন্তু লিবিডোকে এই ছোট গণ্ডিতে ধরা যায় না। পূর্বেই দেখেছি এটি জড়িতজীবন ও মৃত্যুচেতনার সঙ্গে। ইয়ুঙীয় পরিভাষায় vital force, যা জলের মতন প্রবহমান থাকে জীবনজুড়ে বিভিন্ন স্তরে। এটা বদ্ধ জলা নয়। বহমান ও ঊর্ধ্বায়ন। ফ্রয়েডপন্থী হয়েও এখানে ইয়ুঙ আলাদা হয়ে যান যেখানে তিনি মনে করেন অন্ধকারের প্রতি টান যেমন স্বভাবজ, আলোর দিকে মানুষের যাত্রাও তেমন স্বাভাবিক। তারাশঙ্করও সেরকমই ভাবেন। এখানেই তিনি পান ভারতীয় দর্শনকে। এভাবেই পশ্চিমী ধারণাকে গ্রহণ করেও প্রাচ্য প্রত্যুত্তর দিতে থাকেন সেই ঔপনিবেশিক পরিবেশে। যেমনটা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ থেকে গিরিন্দ্রশেখর, সেই প্রথম 'কামসূত্র'-এর দেশ থেকে। এখানেও কাম শুধুমাত্র রীরংসা নয়। তা সামগ্রিক জীবনেচ্ছা। অভীপ্সা। এর মধ্যে বাসনা অংশটির মধ্যেই রীরংসার প্রকাশ। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে বাসনা (desire)-এর সঙ্গে অচেতনসম্পর্কিত। কাম অনেকাংশে সচেতন আকাঙ্ক্ষা। আর বাসনার প্রকাশ ঘটে ব্যসনের মধ্য দিয়ে। শিল্পকলায় এর পরিচয় মেলে। মনু সহ বেশ কিছু স্মার্ত ও দার্শনিক এই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। ফ্রয়েডও সৃজনকে অবদমিত বাসনার প্রকাশ এবং সৃজককে দিবাস্বপ্নদর্শী বলেছেন। স্বাভাবিক ঊর্ধ্বায়নের পথও এটি। তাই তারাশঙ্করের মতন ভারতীয় লেখক, যিনি ফ্রয়েডের পরবর্তী সময়ে সাহিত্যজগতে এসেছেন, ফ্রয়েডের সর্বব্যাপী প্রভাবকে অস্বীকার না করলেও বিনা প্রশ্নে স্বীকরণ করেননি। লিবিডোকে মিলিয়ে পড়তে চেয়েছেন সামগ্রিক কাম ও ঊর্ধ্বায়নের সঙ্গে।

তারাশঙ্করের ওই রূপ গল্পরচনার কারণ তিনি সমগ্র মানবকে এবং মানুষের সমগ্রতাকে ধরতে চান। সেই বৃহৎদৃষ্টিতে সুন্দর ও ভয়ঙ্কর একই পটে ধৃত।তাঁর দৃষ্টি যথার্থ অর্থে প্রকৃতিবাদী। প্রাকৃতবাদী নয়। তাই ধাতুবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তি দুইই তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আয়ত্ত করেছিলেন এক বিরল তন্ময় দৃষ্টি। 'আমার সাহিত্যজীবন' গ্রন্থে তিনি বলছেন – "শিল্পী সাহিত্যিকের আসে একটা তন্ময়তার যোগ, তখন পাত্র-পাত্রীর জীবনের সুখ-দুঃখের মধ্যে ডুবে যায় শিল্পী; তখনই জেগে ওঠে – ফুটে ওঠে।"[২২] কিন্তু এই ডুবে যাওয়া মন্ময়তাজাত নয়। সেইসূত্রেই আসে ঋষিপ্রসঙ্গ। ঋষি অর্থাৎ দ্রষ্টা। তারাশঙ্কর সেরূপ ঋষিদৃষ্টি নিয়ে দেখতে চান জগৎকে। হয়ত তাঁর জমিদারী রক্ত এমন দৃষ্টি নির্মাণে সহায়তা করে।রথীন্দ্রনাথ রায় যথার্থই বলেছেন "কুৎসিত – কদাচারী মানুষের প্রবৃত্তি–তাড়িত দৈনন্দিন জীবনের মধ্যে, তারাশঙ্কর বীভৎসকে সুন্দর করতে জানেন।"[২৩] এটি সম্ভব হয়েছে ক্লাসিক দূরত্বজনিত তন্ময়ীভবনের দ্বারা।

'আমার সাহিত্যজীবন' বই থেকে জানা যায়, তারাশঙ্করের জীবনের অন্যতম দুটি ঘটনা হল তাঁর সরস্বতী মন্ত্রে দীক্ষা নিতে চাওয়া। সরস্বতী অর্থাৎ শিল্প – সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী। ঊর্ধ্বায়িত আত্মা – চেতনা। দ্বিতীয়, একসাগ্নিক ব্রাহ্মণ তাঁকে বলেছিলেন আধারকে মহৎ করে তুলতে। তবেই তাতে দীক্ষার বীজ রোপণ করা যায়। আধারকে মহৎ করাই হল ঊর্ধ্বায়নের পথে যাত্রা।

অন্য ঘটনাটি রসিক পাগল প্রসঙ্গে। পাগল হয়েও যে মৃত্যুরহস্য সম্পর্কিত এক দুরূহ প্রশ্ন উত্থাপন করে। এর সঙ্গেই মিশে যায় মৃত্যুপরবর্তী চেতনা, যা ভারতীয় দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সেখান থেকেই আসে এক আনন্দ ও শান্তি। সাহিত্য সৃষ্টি প্রসঙ্গে তাই তিনি বলেন – "ক্ষোভের কথা কাহিনী তো সাহিত্যের কথা বা কাহিনী নয়, ক্ষোভ-দুঃখকে প্রসন্নতা ও প্রশান্তির মধ্যে জয় করার কথা বা কাহিনীই সাহিত্যের মর্মকথা। সাহিত্য সনাতন ও শাশ্বত ওইখানেই।"[২৪] আবারও সেই ঊর্ধ্বায়ন ও রূপান্তর প্রসঙ্গ। এভাবেই খোঁড়া শেখ থেকে উত্তরণ ঘটে জনাব শেখ-এ। তবে খোঁড়াশেখও বাদ পড়েনা। এখানেই তারাশঙ্করের হৃদয়বত্তা যুক্ত হয় এবং ভেঙে গড়ার স্বপ্ন রূপলাভ করে। প্রবৃত্তির অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। প্রবৃত্তি একদিকে ধ্বংসাত্মক, অন্যদিকে সৃজনমূলক। তন্ময়দৃষ্টিতে এই উভয়কেই প্রত্যক্ষ করেন তিনি। এখানেও দ্বান্দ্বিক প্রেক্ষিত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ফ্রয়েডের এরস থ্যানাটস হোক বা মার্ক্সীয় থিসিস অ্যান্টিথিসিস। মুলেনিটসের ভাবনায় ট্রাজেডিতত্ত্ব। রবীন্দ্রনাথ থেকে তারাশঙ্করের মধ্যে রয়েছে বিদেশি যথাস্থিতবাদ, ডাডাবাদী আন্দোলন। এখানে কল্লোল-কালি-কলম। এসব এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় কারোর পক্ষেই। আবার আন্তর্ধর্মে সম্পূর্ণ গ্রহণও সম্ভব নয়। সেই আন্তর্ধর্মে ছিল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক রক্ত। তারাশঙ্কর একদিকে রাজপ্রতিভূ হয়ে দেখছেন দিনবদলের পালা। এই পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী, তিনি জানেন। সমর্থনও করেন। কিন্তু কোথাও এক মায়া রয়ে গেছে সেই পড়তি সমাজের প্রতি। দ্বন্দ্বের সূচনা এভাবেই। সেখান থেকেই পুরোনো সংস্কৃতিকে বারবার অবলোকন। তাই বারে বারে মন্দির প্রসঙ্গ, সরস্বতী মন্ত্র ইত্যাদি। কিন্তু নতুন দিনের অভিঘাত ইন্ধন জোগায় অচেনায় পা বাড়াতে। ওদিকে তখন ন্যাচারালিজম থেকে সোশিওরিয়ালিজম এসে গেছে। এখানে কিছুটা আশ্রয় হয়ত পায় তারাশঙ্করের মনন। অর্থাৎ ভেঙে গড়ার স্বপ্নটা। কিন্তু ক্ষুধা ও অর্থের নিরিখে মানুষের বিচারও তাঁর মনোমত নয়। ফলত অন্বেষণ। নিয়ত অন্বেষণ। নতুন ভাবনার। নতুন চরিত্রের। একদিকে 'ডাইনি'র মতন গল্প (বাংলায় এমন ডার্ক গল্প কমই আছে), অন্যদিকে রসকলি। এখানে তারাশঙ্কর নিজপথ সন্ধান করেন বৈপরীত্যের মাঝখানে। যথাস্থিতবাদ থেকে শিক্ষা নিয়ে, সমাজবাস্তবতা থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে নিজের ভিন্ন একক গন্তব্যে এগিয়ে যান। এবং তদানীন্তন ঔপনিবেশিক সময়ে এই পথ চলা হয়ে ওঠে গুরুত্বপূর্ণ। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য পূর্বে উল্লিখিত ডাডাবাদ তখনও বাংলাসাহিত্যের কড়া নাড়েনি। এই জাতীয় ভাব আসবে স্বাধীনতার পরে, দেশভাগ পরবর্তী ছিন্নমূল সময় ও সমাজ, ক্ষুধার নতুন দস্তাবেজ, আন্দোলন। ডাডাদের মতন প্রচলিত নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করতে চাইবে সেই সময়ের সাহিত্য। সেই সময়ও তারাশঙ্কর লিখবেন শেষবেলার লেখা। তবে কি তাঁর লেখাকে প্রাচীনপন্থী হিসেবে চিহ্নিত করা উচিত হবে? তিনি তাঁর সমসাময়িক অন্য বন্দ্যোপাধ্যায়দ্বয় ও সেই সময়ের তথাকথিত বুদ্ধিবৃত্তিমূলক সাহিত্যরচয়িতার থেকে পৃথক ছিলেন জীবনের ক্রূরতাকে দেখানোর ভঙ্গিতে। বিভূতিভূষণ এবং মানিকও নির্মম সাহিত্যিক। কিন্তু তারাশঙ্কর

যথাজীবন তথা প্রকাশ করেও এক দার্শনিকতার সঞ্চার করেন সাহিত্যমর্মে। সেখানে তাঁর হাত ধরে প্রাচীন প্রাচ্য অধ্যাত্ম। অথচ সর্বদা তিনি চেয়েছেন সমসাময়িক থাকতে। তাঁর শেষের দিকের লেখায় আসবে সমান্তরালভাবে যুদ্ধের বিবৃতি ও প্রেমের ভঙ্গুরতা। ক্ষুধা ও কামের সর্বগ্রাসী প্রভাব। সেই ভাঙনের চিত্র আঁকবেন, তবে নিজ অন্তরের বিচারে সৃজনমূলকতাই অন্বিষ্ট হওয়া উচিত বলে তাঁর মনে হবে। প্রবৃত্তিকে বাদ না দিয়ে তাকে ঊর্ধ্বায়িত করাই লক্ষ্য। অন্নময় কোষ থেকে আনন্দময় কোষ উদ্দেশে যাত্রা। "অন্ন আমি চাই – কিন্তু তাই সব নয় আমার কাছে। আমি চাই অমৃত। সম্পদ চাই জীবনকে সমৃদ্ধ করতে, কিন্তু জীবন চাই অজ্ঞেয়কে জ্ঞাত হবার জন্য। বস্তুজ্ঞান আমি চাই – আত্মজ্ঞানে উপনীত হবার জন্য।"[২৫] এই রাজবৈরাগ্যের জীবন ও সাহিত্যই তারাশঙ্করের।

তথ্যসূত্র

১। Lawrence, D.H. Manifesto The complete Poetical works of D.H. Lawrence, E-book, books. google.co.in. 15.2.2021.

২। বসু বুদ্ধদেব, বন্দীর বন্দনা,বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭৩,২০০৮, পৃঃ- ২০-২৩।

৩। সেন সুকুমার, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা - ৯,২০০৫, পৃঃ – ৩৫৬।

৪। সেনগুপ্ত অচিন্ত্যকুমার, কল্লোলযুগ,এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড,কলকাতা – ৭৩, ১৪১৬, পৃঃ- ১৮০।

৫। বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, আমার সাহিত্যজীবন (দ্বিতীয়খণ্ড), কল্লোল পাবলিশিং, কলকাতা – ১২, ১৩৭৬, পৃঃ- ৭৭।

৬। তদেব, পৃঃ- ১৯৬।

৭।রায়চৌধুরীগোপিকানাথ, দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকালীন বাংলা কথাসাহিত্য, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা৭৩, ২০১৮, পৃঃ- ২৬৯

৮। কল্লোলযুগ, পৃঃ-১৩।

৯। বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, তারিণী মাঝি, শ্রেষ্ঠ গল্প, বেঙ্গল পাবলিশার্স(প্রাঃ) লিমিটেড,কলকাতা – ৭৩,১৯৯৮,পৃঃ – ৪৮।

১০। Freud Sigmund, On Narcissism, (আন্তর্জালসূত্রে) www. Sigmundfreud.net, P–2-5, প্রবেশের তারিখ- ১৬.২.২০২১

১১। Freud Sigmund, Interpreting Dreams (Trans by J.A. Underwood), Penguin, England, 2006, P- 276.

১২। ফ্রয়েড সিগমুন্ড, টোটেম ও ট্যাবু (ভাষান্তর – ধনপতিবাগ), সুবর্ণরেখা, কলকাতা – ৯,২০১৬,পৃঃ- ১১৪।

১৩। বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, পিতাপুত্র, প্রিয় গল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা – ৭৩, ১৩৬০, পৃঃ- ২৭।

১৪। Engels Friedrich, Origin of the family, Private property and the state, (আন্তর্জালসূত্রে) Marxists Internet Archive. www.marxists.org, p- 29-30, প্রবেশেরতারিখ- ২৭.২.২০২২ ।

.১৫। Oxford Dictonary, lexico.com. Provided by oxford. প্রবেশের তারিখ- ১৭.২.২০২২

১৬। Freud Sigmund, Female sexuality, The Standard Edition of Sigmund Freud, Vol-XXI (1927-1931), The Hogarth press and Institute of psycho-analysis, England, 1968, P-229.

১৭। DO. P-230.

১৮। ভট্টাচার্য্য জগদীশ, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্পের ভূমিকাংশ, পৃঃ- ৮।

১৯। বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, দেবতার ব্যধি, তদেব, পৃঃ- ১৭৫।

২০।বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, (ইমারত) বাছাই গল্প, মণ্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ- ৬৩।

২১। বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, মনের আয়নায় নিজের ছবি,তারাশঙ্কর বীথিকা, সাহিত্যম, কলকাতা, ১৯৭৩, পৃঃ- ২৯৬।

২২। আমারসাহিত্যজীবন (দ্বিতীয়খণ্ড), পৃঃ- ২২।

২৩। রায় রথীন্দ্রনাথ, গল্পকার তারাশঙ্কর, তারাশঙ্কর অন্বেষা, রমা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃঃ- ২১০।
২৪। বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, আমার সাহিত্যজীবন (প্রথমখণ্ড), রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা, পৃঃ- ৩১।
২৫। বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর, শিল্পীর স্বাধীনতা, তারাশঙ্কর বীথিকা, পৃঃ- ২৯২।

সহায়ক গ্রন্থ :-

১। গঙ্গোপাধ্যায় নারায়ণ, সাহিত্যে ছোটগল্প, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃলিঃ, কলকাতা।
২। বসু নিতাই, তারাশঙ্করের শিল্পী মানস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭৩,১৯৯৮।

[প্রবন্ধে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিগুলির বানান অপরিবর্তিত]